গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা | ২১ - ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু
বিজেপি সরকারের অপদার্থতাই দায়ী

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

মহাকুম্ভের বিপুল জনসমাগম সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারের চরম ব্যর্থতা ও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবের ফলে অতি সম্প্রতি প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় পদপিষ্ট হয়ে ও বেশ কয়েকটি আগুন লাগার ঘটনায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সরকারি ভাবে ৩০ জনের নিহত হওয়ার সংখ্যা বলা হলেও বাস্তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি। এরপরেই আবার ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজধানীতে নিউ দিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। প্রয়াগরাজ অভিমুখী ট্রেনে উঠতে গিয়ে রেলের অব্যবস্থায় বিভ্রান্ত হয়ে স্টেশনে সমবেত হাজার হাজার মহাকুম্ভ-তীর্থযাত্রী আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। সরকারি ভাষ্যে ১৮ জনের নিহত হওয়ার কথা বলা হলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য— সংখ্যা আরও অনেক বেশি। অপ্রতুল পরিকাঠামো, প্রয়োজনের তুলনায় কম কর্মী ও সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং আচমকা ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিল্প সম্মেলন অনেক হল, শিল্প নেই কেন?

আরও একটা বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হয়ে গেল নিউটাউনে, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। এ নিয়ে মোট আটবার। ২০১৫ সাল থেকে তৃণমূল সরকার ঘটা করে বাণিজ্য সম্মেলন করে চলেছে। থিম একই— বেঙ্গল মিনস বিজনেস। বাংলা বিনিয়োগের উর্বর ক্ষেত্র, এটা তুলে ধরা সরকারের লক্ষ্য। কারণ বিনিয়োগ না হলে শিল্প হবে না, শিল্প না হলে কর্মসংস্থান হবে না, উন্নয়ন হবে না। কর্মসংস্থান না হলে, বেকারত্ব বাড়বে, অর্থনৈতিক সংকট বাড়বে। সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ফলে কর্মসংস্থানের বা শিল্পের সোনালী স্বপ্ন তুলে ধরা ক্ষমতাসীন সরকারগুলো অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন মনে করে। এতে শিল্পায়ন কতটুকু হয় তা মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে। কারণ শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠা শুধু আবেগ বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। শিল্পের প্রতিষ্ঠা বা বিকাশ দেশের বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত একটি গুরুতর বিষয়।

শিল্পপতি ধরে আনার চেষ্টা সব সরকারই করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও শিল্পপতি ধরে আনতে বারবার বিদেশ সফরে যেতেন। নরেন্দ্র মোদি গুজরাটে বারবার 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট' নামক বাণিজ্য সমারোহ করেছেন। এই কদিন আগে কর্ণাটকে শিল্প সম্মেলনের আয়োজন কংগ্রেসও করেছিল। কেন শিল্পপতিদের এখন ধরে আনতে হয়? তাদের কি বিনিয়োগে অনীহা? অনীহা হবে কেন? বিনিয়োগ হলেই তো মুনাফা। তা হলে? আসলে বিনিয়োগ পরিস্থিতি এখন শুধু এ রাজ্যে নয়, গোটা দেশে, গোটা বিশ্বে অনেকটাই ঝিমিয়ে। বহু চেষ্টাতেও ভোগ্যপণ্যের বাজার চাঙ্গা হচ্ছে না। ক্রেতা যাঁরা হতে পারেন সেই সাধারণ মানুষের পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যে! তারা তেল-সাবান-শ্যাম্পু পর্যন্ত কেনা কমাচ্ছে বলে সমীক্ষকরা সরকারকে

সাতের পাতায় দেখুন

কর্ণাটকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশাল বিক্ষোভ

● *ব্যাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ। ১৩ ফেব্রুয়ারি*

ঘুরপথে কালা কৃষি আইন চালু করা চলবে না
১৮ রাজ্যে এক সঙ্গে কৃষক বিক্ষোভের ডাক

কৃষক আন্দোলনের চাপে বাতিল করতে বাধ্য হলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঘুরপথে সেই কালা কৃষি আইনই চালু করার চেষ্টা করছে। এর প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের ১৮টি রাজ্যের রাজধানী শহরগুলিতে হাজার হাজার কৃষক বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। এ রাজ্যে কলকাতার শহিদ মিনারে ওই দিন কৃষক-খেতমজুরদের মহাসমাবেশ হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। তিনি সরাসরি অভিযোগ তোলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি চাষির স্বার্থে কিছুই করছে না। চাষি তিন টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। লঙ্কা, ফুলকপি, বাঁধাকপির দাম পাচ্ছেন না চাষিরা। খেতমজুরদের সারা বছর কাজ নেই। প্রতিদিন দেশে গড়ে ৫০ জন কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

কৃষকদের ৮০ শতাংশই ঋণগ্রস্ত। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাজার সংস্কারের নামে মান্ডি,

এ রাজ্যে সমাবেশ
শহিদ মিনার
২৫ ফেব্রুয়ারি

হাট, বাজার তুলে দিচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির হাতে। ২০২০ সালের আগস্টে শুরু হয়ে এক বছরের বেশি সময় ধরে দিল্লি সীমান্তে যে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, যাতে ১০ লক্ষ কৃষক প্রাণ বাজি রেখে অংশ নিয়েছিলেন, তার চাপে নরেন্দ্র মোদি সরকার তিনটি কালা কৃষি আইন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এখন চরম নির্লজ্জের মতো ঘুরপথে সেই আইন তারা আবার চালু করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, এআইকেকেএমএস সহ ৫০০টি কৃষক সংগঠনের সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম) ২৪-২৫ জানুয়ারি দিল্লিতে এক সভায় এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে কিসান মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শঙ্কর ঘোষ বলেন, এআইকেকেএমএস-এর দাবি, ১) খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে, ২) লাভজনক দামে কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিপণ্য সরাসরি সরকারকে কিনতে হবে, ৩) কৃষকদের কাছ থেকে কেনা ফসল সুলভ মূল্যে জনগণের

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্য বাজেটে শুধুই চমক

রাজ্য বাজেটের তীব্র সমালোচনা করে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

রাজ্য সরকারের এ বছরের বাজেটে ১০ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ালেও তা কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় ৩৫ শতাংশ কম। কর্মহীন বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কোনও দিশা নেই।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বিজনেস সামিট হয়, কিন্তু কল-কারখানা খোলা হয় না, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয় না। নদী বাঁধ মেরামতের দাবিতে সুন্দরবনের মানুষ দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন। গালভরা 'নদী বন্ধন' প্রকল্প করে মাত্র ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তাতে কতটুকু বাঁধ সংস্কার হবে? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর জন্য পেট্রোল-ডিজেলের উপর সেস প্রত্যাহার করা হয়নি। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু এই প্রকল্পের যে ব্যাপক দুর্নীতি হয় তাতে সত্যিই যাঁদের বাড়ি নেই তাঁরা বঞ্চিত হন। মদ ও লটারির প্রসার যা সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করছে তা হ্রাসের ব্যবস্থা নেই। চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির ঘোষণার কথা বারবার হলেও তা করা হয়নি। এই বাজেটে চমক দেওয়ার চেষ্টা আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মূল সমস্যার সমাধানে কোনও প্রস্তাব নেই।

শিশু-উন্নয়ন নিয়ে সরকার আদৌ ভাবে কি

কেন্দ্র ও রাজ্য দুটি বাজেটেই শিশু খাতে বরাদ্দের পরিমাণ দেখেই সরকারগুলির দায়িত্ববোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্প অর্থাৎ শিশুপুষ্টি প্রকল্পে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে গত বারের তুলনায় বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ০.২৬ শতাংশ। আর রাজ্যে শিশু ও নারী কল্যাণ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কার্যত পুরোটাই গিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে।

সর্বাধিক অপুষ্ট শিশুর সংখ্যায় ভারত বিশ্বে অন্যতম। তার উপর হয়ে চলেছে চড়া হারে মূল্যবৃদ্ধি। সেখানে এই নামমাত্র বরাদ্দ মূল্যবৃদ্ধির সাপেক্ষে বাস্তবে বরাদ্দ হ্রাস। এই দিয়ে শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি বা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটে শিশুদের জন্য মোট বরাদ্দ বেড়েছে আগের বারের তুলনায় মাত্র ৫.৬৫ শতাংশ।

শিশু-পুষ্টির জন্য মায়েদের পুষ্টিও জরুরি। কিন্তু শিশু-মায়েদের পুষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প পোষণ-২ এবং সক্ষম অঙ্গনওয়াড়িতে বরাদ্দ বেড়েছে যৎসামান্য— গত অর্থবর্ষে যা ছিল ২১ হাজার ২০০ কোটি, এই অর্থবর্ষে তা হয়েছে ২১ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা। প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিলের বরাদ্দ মাথাপিছু ৬ টাকা ১৯ পয়সা ধার্য করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ সাড়ে পাঁচ টাকার মতো। বাকিটা রাজ্যের। এই নামমাত্র টাকায় শিশু-কিশোরদের কী পুষ্টি হবে? এটা শিশুদের প্রতি কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন? বিকশিত ভারতে শিশুরা কি তবে অপুষ্ট হয়েই থাকবে? শিক্ষা-স্বাস্থ্যহীন ও অনুন্নয়নের পরিবেশেই কি তবে বড় হবে দেশের আগামী প্রজন্ম?

দেখা যাচ্ছে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক শিশুদের জন্য সরকারি কর্তারা নামমাত্র বরাদ্দ করেই দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। অথচ প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা খাতে বিপুল বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর রাজ্য বাজেটে তো ভোটের দিকে তাকিয়ে জনমোহিনী প্রকল্পের জন্য বরাদ্দে উদারহস্ত সরকার।

যেখানে সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, দেশে সদ্যোজাত থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের ৩৭ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটির মতো শিশু খর্বকায় এবং ১৭ শতাংশ বা ২ কোটি ৭৯ লক্ষের ওজন কম, কম বয়সী মহিলাদের প্রায় ৬০ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছেন, সেখানে তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দের এত দুর্দশা কেন?

পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রে দেশের নীতি-নির্ধারণ থেকে বাজেটে বরাদ্দ— সব কিছুই নির্ধারিত হয় সুনির্দিষ্ট শ্রেণি অর্থাৎ মালিক শ্রেণির স্বার্থে। সেজন্য মহিলা-শিশু সহ দেশের সাধারণ মানুষের জন্য সরকারের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। দায়িত্ববোধ রয়েছে শুধু বন্ধু শিল্পপতিদের মুনাফা-ভাণ্ডার আরও বাড়িয়ে তোলায়! সরকারে আসীন দলগুলি আসলে কাদের প্রতিনিধি, তারা কোন শ্রেণির স্বার্থরক্ষা করছে, তা এতেই পরিষ্কার।

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু

একের পাতার পর

পাল্টানোর ঘোষণা— এই সব কিছুই ঘটনার জন্য দায়ী। হিন্দু ধর্মের একচেটিয়া মালিকানা নিতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদে উস্কানি দিয়ে আরএসএস-বিজেপি-সংঘ পরিবার মহাকুম্ভের মাহাত্ম্য নিয়ে যে সীমাহীন প্রচার চালিয়েছে, তার হাড়িকাঠে আর কত প্রাণ বলি দেওয়া হবে? বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে যে, বারবার এমন মর্মান্তিক ঘটনায় বিপুল সংখ্যক মানুষ, বিশেষত দরিদ্র অংশের মানুষের জীবন নিয়ে আর কত ছিনিমিনি তারা খেলবে। এতগুলি নিরীহ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে কোনও ক্ষতিপূরণই যথেষ্ট নয়।

তিনি বলেন, হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সংহত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে এই ব্যাপক সংখ্যায় তীর্থযাত্রীকে মহাকুম্ভ মেলায় সমবেত হতে কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারই উৎসাহ দিয়েছিল। তারা বিশ্বমানের পরিকাঠামো তৈরির মিথ্যা প্রচার চালিয়েছে। তাদের ভয়ঙ্কর অপদার্থতা ও মিথ্যা প্রচারকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি।

কৃষক বিক্ষোভের ডাক

একের পাতার পর

কাছে সরকারকে বিক্রি করতে হবে, ৪) এনরেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিন কাজ দিতে হবে এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি দিতে হবে, ৫) কৃষকদের সমস্ত কৃষিঋণ মকুব করতে হবে, ৬) ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত কৃষককে মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে, ৭) বিদ্যুৎ বিল-২০২৩ বাতিল করতে হবে, ৮) স্মার্ট মিটার চালু করা চলবে না, ৯) বাজার সংস্কার নীতি চালু করা চলবে না ইত্যাদি।

রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে শঙ্কর ঘোষ বলেন, চাষির আয় নাকি এই সরকারের আমলে সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। চাষির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো রাজ্য সরকারও কিছু করছে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস বলেন, বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গ্রামে যে কৃষক কমিটিগুলি গড়ে উঠেছে, তাদের উদ্যোগে হাজার হাজার কৃষক ২৫ ফেব্রুয়ারির সমাবেশে শহিদ মিনারে সমবেত হবেন। এই সমাবেশ থেকে আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষিত হবে। সংযুক্ত কিসান মোর্চার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য জুড়ে এসকেএম-এর ডাকে বেলা ১১টা থেকে ১২টা পথ অবরোধ হবে। ২০ মার্চ মৌলালি যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে কনভেনশন। রাজ্য সরকার যাতে বিধানসভায় কেন্দ্রীয় জনবিরোধী কৃষিনীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেয়, সে জন্য বিধায়কদের আহ্বান জানানো হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাজভবন ঘেরাও করবেন কৃষকরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ রেণুপদ হালদার এবং অফিস সম্পাদক স্বপন দেবনাথ।

রাজ্য বাজেট কর্মচারীবিরোধী

রাজ্য বাজেটকে জনবিরোধী এবং কর্মচারী বিরোধী আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন কর্মচারীদের ২০টি সংগঠন তীব্র বিরোধিতা করে বলে, অবিলম্বে এআইসিপিআই অনুযায়ী সমস্ত বকেয়া সহ ৩৯ শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে এবং সপ্তম পে কমিশন গঠন করতে হবে।

এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে, এসটিইএ, বিপিটিএ, ডব্লিউবিপিটিএ, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, নার্সেস ইউনিটি, কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ (ইনটাক), ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন।

জীবনাবসান

দলের প্রবীণ কর্মী কমরেড বিপুল রায়, দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগভোগের পর ৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগরের স্বাস্থ্য সদন হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

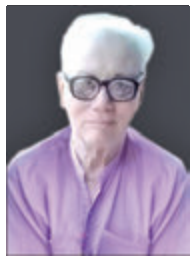

'৬০-এর দশকে তদানীন্তন ছাত্র সংগঠক কমরেড সাধনা চৌধুরীকে কলকাতার চেতলা-কালীঘাট অঞ্চলে দলের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই সময়ে কিছু ছাত্র-যুবক দলের কাছাকাছি আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কমরেড বিপুল রায়। তাঁর বাড়ি ছিল বর্ধমানের পানাগড়ে। কিছু পারিবারিক বিবাদে তিনি ঘর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। কিছু কাল পর কলকাতার ৪৮ লেনিন সরণিতে তদানীন্তন রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড দুর্গা গুহকে সহায়তা করার জন্য বিপুল রায়কে অফিসে নিয়ে আসা হয়। অফিসই হয় তাঁর স্থায়ী বাসস্থান।

কমরেড বিপুল রায় বাইরে রুক্ষ মেজাজি হলেও তাঁর অন্তরটি ছিল কোমল এবং শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। দীর্ঘদিন অফিসের দায়িত্ব পালন করার পর তাঁকে ঘাটশিলায় স্টাডি সেন্টারে পাঠানো হয়। ওই সময়ই তিনি পিঠের ব্যথা সহ আনুষঙ্গিক কিছু শারীরিক সমস্যায় পড়েন। কলকাতায় নিয়ে এসে হার্ট ক্লিনিকে চিকিৎসা করানো হয়। সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে জয়নগর পার্টি সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি থাকতে শুরু করেন। রোগের আরও নানা উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। একটা সময়ে শারীরিক ক্রিয়াকর্মের উপর থেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। অসুস্থতার কারণে তাঁকে জানুয়ারি মাসে আবার জয়নগর স্বাস্থ্য সদনে ভর্তি করা হয়েছিল। ক্রমেই তাঁর শরীরের অবনতি ঘটতে থাকে। শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাঁকে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। অবশেষে ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মরদেহ জয়নগর পার্টি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু, রাজ্য কমিটির সদস্য ও জয়নগর সেন্টার ইনচার্জ কমরেড নিরঞ্জন নস্করের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড জ্ঞানতোষ প্রামাণিক, ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার পক্ষে কমরেড বিশ্বনাথ সরদার মাল্যদান করেন। উপস্থিত অন্যান্য নেতা-কর্মীরাও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। জয়নগর বিষ্ণুপুর শ্মশানে কমরেড বিপুল রায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড বিপুল রায় লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদ জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সুতি-২ লোকাল কমিটির প্রবীণ আবেদনকারী সদস্য কমরেড শামসুল আলম গত ২৭ ডিসেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে শেষ দিকে কোথাও যেতে পারতেন না। কোনও কমরেড দেখা করতে গেলে তিনি খুব খুশি হতেন। দলের খোঁজখবর নিতেন। কমরেড সামসুল আলমের মৃত্যুসংবাদ শুনে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কমরেডরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। কমরেড শামসুল আলম ছিলেন একজন পার্টি-অন্তঃপ্রাণ মানুষ। পার্টির নেতা-কর্মীরা ছিলেন তাঁর কাছে আত্মীয় সমান। তাঁর বাড়ি ছিল পার্টিকর্মীদের অবাধ বিচরণের জায়গা। তিনি স্ত্রী-কন্যা-পুত্রদের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

৩রা ফেব্রুয়ারি সুতি লোকাল কমিটির উদ্যোগে কমরেড শামসুল আলমের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন স্মরণসভার মুখ্য আলোচক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মির্জা নাসিরউদ্দিন। এ ছাড়াও স্মৃতিচারণা করেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সামিরুদ্দিন সহ লোকাল নেতৃত্ব। সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শিশির সিংহ। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন পার্টির সুতি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মনোজ পাল।

কমরেড শামসুল আলম লাল সেলাম

আদর্শ ও রাজনীতি, কোনও ক্ষেত্রেই বিজেপি-কংগ্রেসের বিকল্প হতে পারেনি আপ

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে অনেকে বিস্মিত হয়েছেন, অনেকে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, তা হলে আপও হারল! তা-ও বিজেপির কাছে! বিজেপিকে গত দুটি বিধানসভা নির্বাচনে আপ গো-হারান হারিয়েছিল। এ বার সেই আপের এমন দুর্দশা হল কেন?

ভোটার সংখ্যায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কিংবা ভোটের চার দিন আগে কেন্দ্রীয় বাজেটে কল্পতরু সাজাই নিশ্চয় এর একমাত্র কারণ নয়। তা হলে বিজেপি আপের সমর্থকদের মধ্যে এমন বড় মাপের ধস নামাতে পারল কী করে?

অনেকেরই মনে আছে প্রথম বার বিধানসভা নির্বাচনে আপের দিল্লি মসনদ দখলের পর দেশজুড়ে আপ-রাজনীতির এমন ঢেউ উঠেছিল যে দেশের বড় বড় শহরগুলির মতো কলকাতারও মোড়ে মোড়ে কিছু ব্যক্তি টেবিল নিয়ে বসে গিয়েছিলেন আপের সদস্য করার জন্য। সে দিন আপের প্রতি মানুষের এমন সমর্থনের প্রধান কারণটা কী ছিল?

সময়টা কেন্দ্রে দ্বিতীয় ইউপিএ-র অন্তিম কাল। এক দিকে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে ক্রমাগত জনবিরোধী নীতি নেওয়া, অন্য দিকে টেলিকম, কয়লা, কমনওয়েলথ গেমস সহ একের পর এক নানা দুর্নীতিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভে ফুটছে। এমন সময়ে দিল্লিতে দুর্নীতির মামলাগুলির দ্রুত তদন্ত ও বিচারের জন্য লোকপাল নিয়োগের বিল নিয়ে আসার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন সমাজকর্মী আন্না হাজারে। সেই আন্দোলনেই দুর্নীতি বিরোধী মুখ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন প্রাক্তন আমলা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা দ্রুত তলানিতে পৌঁছতে থাকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আম আদমি পার্টি নামে দল গড়েন কেজরিওয়াল। এই নতুন দলে যোগ দেন আন্নার বেশ কিছু সহযোগী। কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতা হারানোর পরের বছর দিল্লির বিধানসভা ভোটে প্রথম নেমেই কংগ্রেসকে শূন্য করে দেয় আপ। বিজেপি পায় মাত্র ৩টি আসন।

আপের এই বিরাট জনসমর্থনের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করেছিল সাধারণ মানুষ বিশেষত দিল্লির মধ্যবিত্ত অংশের কংগ্রেসের দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা। এই দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবেই কেজরিদেরও মানুষ গ্রহণ করেছিল। দল গঠনের পর তাঁদের দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বাস করেছিল। ক্ষমতায় বসার পর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে বেশ কিছু পদক্ষেপ মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছিল। সরকারি স্কুলগুলির উন্নয়ন ঘটেছিল। মহল্লা ক্লিনিক জনপ্রিয় হয়েছিল। গরিব গৃহস্থের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাসে যাতায়াত মানুষকে খুশি করেছিল। এর সঙ্গে ছিল পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক প্রচার। কারণ পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে তখনও অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। দিল্লিতে বিজেপি তখনও অনেকখানি দুর্বল। এই প্রচারে ভেসে গিয়ে মানুষ বিচার করতে ভুলে গেল যে, দুর্নীতির উৎস মুনাফাসর্বস্ব এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি। তাকে উপড়ে ফেলার পরিবর্তে মানুষ দল পাল্টে এর হাত থেকে রেহাই পেতে চাইল। ফলে দ্বিতীয়বারও আপ প্রায় একই রকম জনসমর্থন পেয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল।

এর পরই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিবাদী নিয়মকে মেনে নিয়ে, অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থকে রক্ষা করেই কাজ করতে থাকে আপ। যেমন একচেটিয়া বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির অন্যায় লুঠের বিরোধিতা না করে সরকারি কোষাগার থেকে গৃহস্থের বিদ্যুতের দাম মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় আপ। ফলে একের পর এক দুর্নীতিতে জড়াতে থাকেন আপ নেতারা। রাজস্ব আদায়ের সহজ উপায় হিসাবে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিতে গিয়ে আবগারি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যান আপ নেতারা। গ্রেফতার হয়ে জেলে যান মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। মহল্লা ক্লিনিকগুলি সম্পর্কে নানা গাফিলতির অভিযোগ উঠতে থাকে। স্কুলগুলিরও একই দশা হয়। দলের নেতাদের সম্পর্কে দাম্ভিক এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনের অভিযোগ উঠতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের আবাসবাড়িটি কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সাজানোর অভিযোগ তুলে ব্যাপক প্রচার চালায় বিজেপি। অর্থাৎ আপের বিকল্প তথা স্বচ্ছ রাজনীতির ভাবমূর্তিটি ভেঙে পড়তে থাকে।

দিল্লিতে যানজট, বায়ু দূষণ এবং যমুনা জল দূষণ রোধে আপ প্রশাসন ব্যর্থ বলে জনমানসে ধারণা হয়। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মোকাবিলার পরিবর্তে আপ নেতৃত্ব নরম হিন্দুত্বের আশ্রয় নেয়। কেজরিওয়াল নিজেকে হনুমানের ভক্ত বলে প্রচার করতে থাকেন। দিল্লি দাঙ্গায় নিরপেক্ষতার ভান করে হিন্দুত্বের পক্ষে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই নরম হিন্দুত্ব দিয়ে শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘ পরিবারের প্রবল হিন্দুত্ববাদী ধুরন্ধর রাজনীতির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয় আপ।

এই রকম পরিস্থিতিতে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্যের পর দিল্লি জয় করতে নতুন উৎসাহে নামে বিজেপি। ভোটের প্রচারে নামায় আরএসএস বাহিনীকে। অন্য দিকে যে খয়রাতি-রাজনীতির উপর আপ দাঁড়িয়েছিল, বিজেপির প্রতিশ্রুতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে ছাপিয়ে যায়। খয়রাতি বা সুবিধা দেওয়ার রাজনীতির অসুবিধা হল, গত বার যে ঘোষণায় ভোটাররা উল্লসিত হয়েছিল, এ বার বিরোধী কোনও দল তার থেকে বেশি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে জনতা তার পক্ষে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির আসল কারণ যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা যত দিন টিকে থাকবে তত দিন যে সেগুলির সমাধান দূরের কথা, বাড়তেই থাকবে, এই কঠোর সত্যিটি সম্পর্কে শোষিত জনগণকে সচেতন করার পরিবর্তে তাকে আড়ালই করে গেছে আপ রাজনীতি। মানুষের মধ্যে শ্রেণিচেতনা এনে দেওয়া, অর্থাৎ কোন শ্রেণি বা শ্রেণি দল সাধরাণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে, আর কোন শ্রেণি বা শ্রেণি দল জনতার সেবার মুখোশ পরে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করবে— একমাত্র এই চেতনা গড়ে উঠলেই মানুষ বিজেপির ধূর্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, পুঁজিবাদী শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার রাজনীতি ধরতে পারত এবং তাকে প্রত্যাখান করত। তা হয়নি আপের নিজের পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি রাজনীতির জন্যই।

আপের দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে ভুলে, কোনও রকম বাছবিচার না করেই মানুষ যে দিন তার পিছনে ছুটেছিল সে দিন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছিল যে, পুঁজিবাদের বর্তমান তীব্র বাজারসঙ্কটের যুগে দুর্নীতি পুঁজিবাদের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত পুঁজিবাদকে যে দল সেবা করবে, তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করবে, সেই দলও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এবং জনস্বার্থকেও শেষপর্যন্ত তারা পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থের পায়ে বিসর্জন দিতে বাধ্য হবে।

আপের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ফলে আদর্শ ও রাজনীতি কোনও ক্ষেত্রেই আপ বিজেপি-কংগ্রেসের পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনীতির বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। আজ যাঁরা আপের পরাজয়ে বিস্মিত

ছয়ের পাতায় দেখুন

আয়কর ছাড় দিয়ে বাজার সঙ্কট দূর করা যাবে কি

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটের শুরুতে অর্থমন্ত্রীর নির্মলা সীতারমণ বাজেটের প্রধান লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করে বলেছেন, আর্থিক বৃদ্ধির হার দ্রুততর করা, সর্বজনীন উন্নয়নের পথে হাঁটা, বেসরকারি লগ্নিকে উৎসাহ দেওয়া, গৃহস্থালীর মনোবল বৃদ্ধি এবং ভারতের উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি। একই সাথে দেশবাসীর সামনে 'বিকশিত ভারতে'র স্বপ্ন ফেরি করার কাজটিও তিনি করেছেন বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

এ বারের বাজেটের সবচেয়ে বড় চমক হল মধ্যবিত্তের জন্য আয় কর ছাড়, যা নাকি মধ্যবিত্তের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করবে! আর এই চমক নিয়েই এখন দেশের রাজনীতি সরগরম। একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদমাধ্যম এটাকেই পাদপ্রদীপের আলোয় আনছে। আয় কর ছাড়ের মধ্য দিয়ে মানুষের হাতে যে বাড়তি টাকা আসবে, তা তারা কেনাকাটাতে ব্যয় করবে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই দাবি ও প্রত্যাশা কতটা সঠিক সেটা অবশ্যই বিচার করা দরকার। যেমন, মধ্যবিত্ত বলে অর্থমন্ত্রী যে স্তরকে বোঝাতে চেয়েছেন তারা আসলে কোন মানুষগুলি তাও বোঝা দরকার। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-র তথ্য অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে যে ৮ কোটির মতো মানুষ আয়কর রিটার্ন দিয়েছেন তাদের মধ্যে নতুন আয় কর ছাড়ের সুবিধা পাবেন ৪ কোটির সামান্য বেশি কিছু মানুষ। জনসংখ্যার ৩৩ শতাংশকে মধ্যবিত্ত বলে ধরলেও আয়কর দেওয়ার মতো আয় করেন এর মাত্র ৩ শতাংশ। অর্থাৎ 'মধ্যবিত্ত' বলে যাদের দেখানো হচ্ছে তারা আসলে মধ্যবিত্ত নয়, বরং আয়ের বিচারে এরা দেশের উপরের স্তরে থাকা মুষ্টিমেয় মানুষ। অর্থাৎ, বিজেপি সরকারের আয় কর নীতির মাধ্যমে লাভবান হতে চলেছে দেশের একটা বড় সংখ্যক উচ্চ আয়ের মানুষ।

এখন দেখা যাক, ভারতে একজন মানুষের গড় আয় কত। পিরিয়ডিক লেবার পিএলএফএস-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এ দেশে একজন স্বনিযুক্ত ব্যক্তির মাসিক আয় ১৩,২৭৯ টাকা। নিয়মিত বেতনভোগী মানুষের গড় আয় মাসিক ২০,৭০২ টাকা এবং ঠিকা শ্রমিকের মাসিক গড় আয় ১২,৭৫০ টাকা। তথ্য অনুসারে দেশের শ্রমশক্তির ২৫ শতাংশ মাসে ১৫ হাজার টাকার বেশি আয় করেন এবং নিচের দিকের ২৫ শতাংশ মানুষের মাসিক গড় আয় ৩ হাজার টাকার কম। এ ছাড়াও দেখা যাচ্ছে গ্রামের ৪৬ শতাংশ এবং শহরের ২৪ শতাংশ পুরুষ-শ্রমিকের দৈনিক আয় ৩০০ টাকার কম। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে গ্রামের ৯১ শতাংশ এবং শহরের ৬৪ শতাংশ মহিলা-শ্রমিকের মাসিক আয় ছিল ৯ হাজার টাকার কম। দেখা যাচ্ছে, দেশের যে ৭০-৭৫ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকার কম, তাদের জন্য সরকারি সাহায্য অর্থাৎ বিনামূল্যে ভাল মানের শিক্ষা, বিনামূল্যের চিকিৎসা, খাদ্যে ভর্তুকির জন্য শক্তিশালী গণবণ্টন ব্যবস্থা, গ্রাম ও শহরের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রভৃতি পদক্ষেপগুলি কার্যকরী করা অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন। আরেকটি সমীক্ষা থেকে আমরা দেখছি যে ২০১৭-১৮ সালের পর থেকে চাকরিজীবী সহ সমস্ত ক্ষেত্রে এ দেশে পুরুষ ও মহিলা উভয় কর্মীরই প্রকৃত আয় কমেছে। তাৎপর্যপূর্ণ হারে বেড়েছে আর্থিক অসাম্য। অন্যদিকে এই সময়কালের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সহ বিভিন্ন পণ্যে পরোক্ষ কর কমলেও তার সুবিধা সব মানুষের কাছে পৌঁছতে পারত, তা কিন্তু একেবারেই হয়নি। এমতাবস্থায় পরোক্ষ কর না কমিয়ে আয়ের শীর্ষে থাকা বাস্তবে ৫ শতাংশের কম মানুষকে কর ছাড় দিলে তা অসাম্যকে আরও বাড়াতে সাহায্য করবে।

এই বাজেটে কার্যকরী ভাবে ব্যক্তিগত আয়কর (পিআইটি) কমিয়ে ভারতের শহুরে মধ্যবিত্তের হাতে অতিরিক্ত এক লাখ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। প্রশ্ন হল অর্থনীতিতে এর প্রভাব কী পড়বে? আমরা জানি যখন মানুষের কাছে বেশি টাকা থাকে তখন তারা বেশি খরচ করে। যে দোকানদার বা ব্যবসায়ী এই অর্থ পায় তারা তাদের কর্মচারীদের এবং সরবরাহকারীদের আরও টাকা দেয় যা আরও বেশি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাজেটে বঞ্চনা
প্রতিবাদে মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

রাজ্য বাজেটে মিড ডে মিল কর্মীদের জন্য মাসিক বেতনের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। বর্তমানের মূল্যবৃদ্ধির বাজারে মাত্র ২০০০ টাকা মাসিক বেতনে সংসার চালানো অসম্ভব। সেজন্য মিড ডে মিল কর্মীরা ৭ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রোজেক্ট ডাইরেক্টরের কাছে বেতন বৃদ্ধি সহ নানা দাবি পেশ করেছিলেন। কিন্তু বাজেটে বেতনবৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়নি সরকার। এর প্রতিবাদে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলা ও ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ডহারবারে হসপিটাল মোড় থেকে প্রায় শতাধিক মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। তারপর জনস্বার্থবিরোধী রাজ্য বাজেট পোড়ানো হয়। বাজেটের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের যুগ্ম রাজ্য সম্পাদিকা মনোরমা হালদার।

উড়ালপুলের দাবিতে আন্দোলন কৃষ্ণনগরে

কৃষ্ণনগর সিটি জংশন রেলওয়ে স্টেশনের কাছেই বেলেডাঙ্গা রেলগেট বহু সময় বন্ধ থাকার ফলে রেলগেটের দুই পাশে অসংখ্য গাড়ি সারি

দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয় যতক্ষণ না রেলগেট খোলে। দিকনগর চকদিগনগর দেপাড়া ভাতজাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কৃষ্ণনগর শহরে যাতায়াতের মধ্যেই পড়ে এই রেলগেট। জেলা সদর হাসপাতাল এবং শক্তিনগর হাসপাতালে সংকটাপন্ন রোগীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসার সময় রেললাইনে গেট বন্ধ হলে হাসপাতালে পৌঁছাতে অনেক সময় দেরি হয়। এই বিলম্বের কারণে অনেকেরই মৃত্যু হয়। ফলে রেললাইনের উপর দিয়ে উড়ালপুলই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

বিভিন্ন সময় রেলমন্ত্রণালয় এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি উড়ালপুল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। উড়ালপুল নির্মাণের দাবি নিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের কৃষ্ণনগর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমল দত্ত, নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য জয়দীপ চৌধুরী, দীপক চৌধুরী প্রমুখ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে বরাদ্দ লাগাতার আন্দোলনেরই জয়

চলতি রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে প্রথম দফার কাজের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এই জয়। এজন্য সংগ্রামী জনসাধারণকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি ঘাটাল কলেজ বাসস্ট্যান্ড থেকে বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করে।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের কয়েকটি প্রস্তাব সংক্রান্ত খোলা চিঠি ই-মেইল মারফত পাঠিয়েছি। ওই চিঠির কপি সেচমন্ত্রী সহ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মনিটরিং কমিটির সদস্যদেরও পাঠানো হয়েছে।

নারায়ণ নায়ক জানান, ২০১৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কলেজ বাসস্ট্যান্ডে তৎকালীন বিধায়কের লোকজনেরা বানভাসি জনসাধারণকে লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করেছিলেন অশ্বিনী মালিককে। এ দিন মিছিলের শুরুতে অশ্বিনী মালিককে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমিটির উপদেষ্টা মধুসূদন মান্না, গৌরীশঙ্কর বাগ, সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা, কার্যকরী সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি, অফিস সম্পাদক কানাই লাল পাখিরা প্রমুখ। তাঁরা জেলা-মহকুমা-ব্লক লেবেলে কমিটির প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে তদারকি কমিটি গঠনের দাবি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয় চলো
অভিযানের ডাক এআইডিএসও-র

১৫ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেটে বেকারদের কর্মসংস্থান, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানো সহ জনজীবনের বুনিয়াদি সমস্যাগুলো সমাধানের কোনও দিশা নেই।

একইভাবে নেই শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক অধ্যাপক কর্মচারী নিয়োগ, মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি, ধসে পড়া সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার বিষয়ে কোনও কথা এই বাজেটে নেই। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়নে টাকা বরাদ্দের কথা না বলে কেন্দ্র রাজ্য দুই সরকারই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ করার ঘোষণা করেছে।

বিশ্বজিৎ রায় বলেন, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোর বেহাল দশা, অথচ রাজ্যে নতুন করে আরও তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তরুণের স্বপ্ন নামের প্রকল্প চালু করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্মার্টফোন তুলে দিয়ে শিক্ষার মূল আঙ্গিনা থেকে তাদের দূরে সরানোর আয়োজন করা হয়েছে এই বাজেটে। এ আই ডি এস ও নেতৃত্ব এই বাজেটকে চূড়ান্ত শিক্ষা ও ছাত্র স্বার্থবিরোধী বলে আখ্যা দেন।

সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্য জুড়ে পরিকাঠামোর অভাবে ৮২০৭-টির বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ হচ্ছে, আরও বহু স্কুল বন্ধের মুখে। পাশ-ফেল ব্যবস্থা না থাকা, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থার অবলুপ্তি, সেমিস্টার প্রথা চালু সহ জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ মেনে ধ্বংস করা হচ্ছে সরকারি স্কুলশিক্ষাকে। বিশ্বজিৎ রায় বলেন, ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ার জন্য দায়ী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু করা, নিয়মিত ক্লাসরুমভিত্তিক পঠনপাঠন না হওয়া, লাইব্রেরি-ল্যাবরেটরি সহ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত সমস্যা।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন না করানোর ফলে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসক দলের পেটোয়া ছাত্র সংগঠনের তোলাবাজি দুর্নীতি এবং দলবাজি চলছে। রাজ্যে ইতিমধ্যেই গড়ে ওঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিকাঠামো নেই, বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশোনা হয় না, যখন তখন বিভিন্ন খাতে অযৌক্তিক ভাবে ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ম্যাকাউট সহ রাজ্যের একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশ হচ্ছে না, টাকা দিয়ে রেজাল্ট, ডিগ্রি কেনাবেচা সহ নানা ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি চলছে।

রাজ্যের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বেহাল অবস্থা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে আশঙ্কিত করে তুলেছে। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও সর্বদাই শিক্ষার দাবিতে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক শিক্ষাপ্রেমী মানুষকে একত্রিত করে শিক্ষা বাঁচানোর আন্দোলনকে তীব্রতর করে গড়ে তুলেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজ্যের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেব্রুয়ারি ও মার্চে উপাচার্যের কাছে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সহ আন্দোলনের আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রকাশিত হয়েছে

সংগ্রহ করুন

করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কমিটি গঠন

বিজেপি পরিচালিত আসাম সরকার উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর তীব্র বিরোধিতায় নেমেছেন করিমগঞ্জের নাগরিকরা। ১২ ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জের বিপিন চন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

তিন শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সুনীত রঞ্জন দত্ত, নির্মল কুমার সরকার, হিফজুর রহমান, সুদীপ্তা দে চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশন পরিচালনা করেন। বক্তব্য রাখেন আইনজীবী অরুণাংশু ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজকর্মী নির্মল কুমার দাস, সাহিত্যিক বরুণ কুমার সিনহা, নাগরিক রজত চক্রবর্তী, আইনজীবী সুব্রত পাল, সমাজকর্মী ডাঃ এম শান্তি কুমার সিংহ, মৌলানা আবুল হুসেন, তুষার পুরকায়স্থ, প্রোজ্জ্বল দেব প্রমুখ।

তাঁরা ক্ষোভের সাথে বলেন, এনআরসি রূপায়ণের নামে সরকার ১৯ লক্ষ নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে যার সিংহভাগই বরাক উপত্যকার। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরির ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতীদের বঞ্চনা, শিক্ষা, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন পরিষেবা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা এবং বরাক উপত্যকার দুটি বিধানসভা কেন্দ্র বিলোপ করা ইত্যাদি ঘটনা প্রমাণ করে বরাক উপত্যকার প্রতি আসাম সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি চরম উগ্র প্রাদেশিকতাকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক।

কনভেনশন থেকে করিমগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন প্রতিরোধ নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। তার পাঁচ আহ্বায়ক যথাক্রমে সুনীত রঞ্জন দত্ত, অরুণাংশু ভট্টাচার্য, রজত চক্রবর্তী, বদরুল হক চৌধুরী ও সুদীপ্তা দে চৌধুরী কমিটির পক্ষ থেকে জনসাধারণকে জেলার নতুন নাম বর্জনের আহ্বান জানান। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জেলার সর্বত্র শহিদ বেদি স্থাপন ও শপথ গ্রহণ ছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

জেলার সর্বত্র প্রচারপত্র বিলি, পোস্টারিং ও ওয়ালিং, পথসভা ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রাম কমিটি গঠন, বরাক উপত্যকার বিধায়ক ও সাংসদের কাছে স্মারকপত্র দিয়ে তাঁদেরও এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো সহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থানে জনসভার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে
এস ইউ সি আই (সি)-র শোকপ্রকাশ

প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১৫ ফেব্রুয়ারি গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছে— গরিব শোষিত মানুষের প্রতি আন্তরিক দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি সঙ্গীতশিল্পীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্গীত জগত তো বটেই মেহনতি মানুষও একজন আন্তরিক সুহৃদকে হারাল।

দলের ও বিভিন্ন গণসংগঠনের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র সদনে শায়িত প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পীর মরদেহে মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশে বইমেলায় ধর্মান্ধ দুষ্কৃতীদের হামলা
প্রতিবাদে পথে নামলেন বিশিষ্টজনরা

অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত বইমেলার একটি স্টলে ৮ ফেব্রুয়ারি উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও কোরানের তুলনামূলক আলোচনা সংক্রান্ত একটি বইয়ের বিরুদ্ধে তাদের রোষ আছড়ে পড়ে। তারা স্টলটি ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার প্রতীক ও জ্ঞানের ভাণ্ডার বইয়ের উপর এই হামলার প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারি লেখক ও বইপ্রেমীদের একটি যুক্তমঞ্চ পছন্দের বইপত্র হাতে তুলে ধরে বিক্ষোভ মিছিল করে।

খাদ্য, পরিধান ও বইয়ের ক্ষেত্রে মানুষের পছন্দ-অপছন্দের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের ফরমান জারির বিরুদ্ধে এই মিছিলে শামিল হন সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত তেলুগু সাহিত্যিক অধ্যাপক মধুরন্তাকম নরেন্দ্র সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা।

অধ্যাপক নরেন্দ্রর হাতে ছিল এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ রচিত 'শরৎসাহিত্য পাঠ কেন আজও প্রাসঙ্গিক' বইটি। মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস অনুমোদিত গণফোরাম পিসিভি-র সভাপতি ভাকা প্রসাদ বিক্ষোভ মিছিলটিতে নেতৃত্ব দেন।

বন্ধ চা-বাগান খোলার দাবিতে বীরপাড়ায় মিছিল

শ্রমকোড বাতিল, বন্ধ চা-বাগান ও বন্ধ কলকারখানা খোলা, স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও বেতন বৃদ্ধি সহ মূল্যবৃদ্ধি এবং বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এআইইউটিইউসি-র ডাকে ১১-১৭ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ জুড়ে চলেছে দাবি-সপ্তাহ। তারই অঙ্গ হিসাবে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া ইউনিটের পক্ষ থেকে বীরপাড়া চৌপথিতে মিছিল এবং দাবি সপ্তাহ উপলক্ষে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আলিপুরদুয়ার জেলার সহ-সভাপতি কমরেড গোপাল খেস, আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণালকান্তি রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরে এক কিশোরীর ধর্ষণ ও খুনে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে নিউটাউন থানায় বিক্ষোভ এআইএমএসএস, এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র। ৮ ফেব্রুয়ারি

নিয়মিত ট্রেন চালানোর দাবিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে
দাবিপত্র এস ইউ সি আই (সি)-র

এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ১০ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে প্রতিনিধি ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

রেলের সময়-সারণি মেনে সমস্ত ট্রেন চালানো, আগাম ঘোষণা না করে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া হঠাৎ কোনও ট্রেন বাতিল না করা, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উন্নয়ন না করে এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা লাগিয়ে বর্ধিত ভাড়া আদায় বন্ধকরা, প্রতিটি স্টেশনে বিনামূল্যে পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, বেলদা, বালিচক, পাঁশকুড়া প্রভৃতি রেলস্টেশনের কাছাকাছি জনবহুল এলাকার রেলগেট-লেভেল ক্রসিংগুলির উপর দিয়ে অবিলম্বে ফ্লাই-ওভার, আন্ডারব্রিজ নির্মাণ, বেলদা-দিঘা নতুন রেললাইন স্থাপন, ঝাড়গ্রাম, হলদিয়া বা দিঘা থেকে খড়গপুর ও হাওড়ার সাথে সংযোগকারী ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো, গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির দু'দিকে বুকিং কাউন্টার এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফট অথবা এস্কালেটরের ব্যবস্থা করা, লোকাল ট্রেনের ভিতরের ডিসপ্লে বোর্ডে এবং মাইকে সেই ট্রেনের বিভিন্ন অবস্থানের এবং পরবর্তী যে স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে তার সংবাদ ভেতরের যাত্রীদের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, যাত্রী সুবিধার্থে সমস্ত ট্রেনে তার পুনঃপ্রবর্তন করা, নিরাপত্তা এবং ন্যূনতম যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়গুলিকে নিশ্চিত করা প্রভৃতি দাবি জানানো হয়। প্রতিনিধিদলে এ ছাড়াও ছিলেন জৈমিনি বর্মন, গৌরীশঙ্কর দাস, কণিকা ধাড়া ও সুনীল জানা।

পাঠকের মতামত

অস্ত্র বিক্রির স্বার্থেই যুদ্ধ

‘প্রতিরক্ষা খাতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কাদের রক্ষা করতে’ (৭৭ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৪ ফেব্রুয়ারি) লেখাটিতে সঠিক ভাবেই বলা হয়েছে যে, ইউক্রেন এবং প্যালেস্টাইন যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, লক্ষ লক্ষ মানুষের আহত হওয়া এবং বিস্তীর্ণ এলাকার ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পরও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি কেউই যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিচ্ছে না। বাস্তব তথ্যের দিকে তাকালে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন এই রাষ্ট্রগুলি কেউই শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে না। এমনকি ভারতও মুখে শান্তির কথা বললেও উভয় যুদ্ধেই ভারতীয় যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন কোম্পানিগুলির অস্ত্র কাজ করছে। ক’দিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, গত তিন বছরের যুদ্ধে আমেরিকা ইউক্রেনকে ৩০ হাজার কোটি ডলার মূল্যের সহায়তা করেছে। বলা বাহুল্য, এই সহায়তা আসলে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম জুগিয়ে সহায়তা। এই সুযোগে মার্কিন অস্ত্র উৎপাদন কোম্পানিগুলি ফুলে-ফেঁপে লাল হয়ে উঠেছে (সূত্র ঃ আবাপ, ৫ ফেব্রুয়ারি)। সম্প্রতি আর একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকার পূর্বতন প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন ইউক্রেনকে অস্ত্র জোগানোর জন্য ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম তৈরি করেছিলেন। গত তিন বছরে ৫০টি রাষ্ট্র সম্মিলিত ভাবে ইউক্রেনকে ১২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম জুগিয়েছে (দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১২ ফেব্রুয়ারি)। সম্প্রতি আরও একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ট্রাম্প এবং পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে নাকি কথা চালাচালি করছেন। কিন্তু ইউক্রেনকে এই আলোচনায় ডাকা হয়নি। এর থেকে স্পষ্ট যে, এই যুদ্ধে হাজার হাজার ইউক্রেনীয় সৈনিক প্রাণ দিলেও এই দীর্ঘ যুদ্ধে ইউক্রেনের ভূমিকা কার্যত দাবার বোড়ের। ইউক্রেনকে সামনে রেখে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি সবাই নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। তাই যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে ইউক্রেনকে ‘তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও, আমরা তোমার পিছনে আছি’ বলে তালি দিয়ে চলেছে।

বাস্তবে আজ সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই তীব্র বাজার সঙ্কটে ভুগছে। পুঁজিবাদী তীব্র শোষণের অনিবার্য ফল হিসাবে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে নেমে গেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতেই মানুষ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, ভোগ্যদ্রব্যের বাজারে তাই তীব্র মন্দা। আর সেই সঙ্কট থেকে রেহাই পেতে অর্থনীতির সামরিকীকরণের রাস্তাকেই বেছে নিয়েছে রাষ্ট্রগুলি। অস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণ আজ প্রতিটি অগ্রসর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান উৎপাদন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদিত অস্ত্র খালাস করা এবং আরও উৎপাদন বাড়ানোর জন্যই তাদের যুদ্ধ চাই। তাই যুদ্ধ বাধানোই আজ তাদের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। অথচ যতদিন সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল, তত দিন তাদের ঘোষিত নীতি ছিল, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। এই নীতিতে ঘোষণা করা হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক শিবির কাউকে আক্রমণ করবে না, কোনও দেশে সৈন্য পাঠাবে না, কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। সাম্রাজ্যবাদীদেরও একই নীতি অনুসরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের সুয়েজ ক্যানেলের জাতীয়করণ ঘোষণা করলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তার তীব্র প্রতিবাদ করে। আমেরিকা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সমর্থনে নৌবহর পাঠালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেয় নৌবহর প্রত্যাহারের জন্য। সোভিয়েত শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে আমেরিকা ২৪ ঘণ্টার আগেই তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। এই ভাবে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের হস্তক্ষেপে সে দিন আরব অঞ্চলে যুদ্ধ পরিস্থিতিকে এড়ানো সম্ভব হয়। আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে অন্য দেশের উপর চড়াও হওয়া, আক্রমণ করা, হত্যা ও লুঠতরাজ চালানো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিত্যদিনের কাজ হয়ে উঠেছে। বাস্তবে আজ যুদ্ধ বন্ধের জন্য এক দিকে যেমন দেশে দেশে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, তেমনই শোষিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামকে তীব্র করতেই হবে। তাবেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পুঁজিবাদী শিবিরকে বাধ্য করা সম্ভব হবে।

মানব মিত্র, কলকাতা ৯৯

মিড ডে মিলে বরাদ্দের দাবি এআইইউটিইউসি-র

মিড ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ ছাত্র পিছু প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বরাদ্দ ৬ টাকা ১৯ পয়সা এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বরাদ্দ ৯ টাকা ২৯ পয়সা। কিন্তু এই টাকায় পুষ্টিকর খাবার দেওয়া অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে না। ১৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস।

তিনি বলেন, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মিড ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ টাকার মধ্যে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা বাড়তি হাতে থাকবে। এই বাড়তি টাকা থেকে ৭৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করে অতিরিক্ত ডিম বা ফল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তাও দেওয়া হবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। তার পর সপ্তাহে একবার করেই ডিম দেওয়া হবে। তখন ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির কী হবে? রন্ধন কর্মীদের বেতন দেওয়া হয় মাসে মাত্র ২ হাজার টাকা। তাও দেওয়া হয় ১২ মাসের মধ্যে ১০ মাস। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, বোনাস, অবসরকালীন অনুদান এবং ১২ মাসই বেতন দিতে হবে।

বাজার সঙ্কট দূর করা যাবে কি

তিনের পাতার পর

ব্যয় করতে সাহায্য করে। এবং এই শৃঙ্খল প্রক্রিয়াটি মূল পরিমাণের প্রভাবকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে তখনই যখন মানুষের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি ঘটার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধিও ঘটে থাকে। কিন্তু আমরা দেখছি যে বর্তমান কর ছাড় এ দেশের ভোগবৃদ্ধির অস্থিরতাকে কমিয়ে দিয়ে মধ্যবিত্তদের আকৃষ্ট করার জন্য কোনও ভাবেই যথেষ্ট নয়।

আবার পুঁজিবাদী অর্থনীতির পণ্ডিতরা বলেন যে মানুষের হাতে বেশি টাকা এলে চাহিদা বাড়বে, ফলে দামও বাড়বে (চাহিদা-চালিত মুদ্রাস্ফীতি)। এটাও সত্য নয়। দাম বাড়ছে চাহিদা কমের জন্য নয়, পুঁজিমালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য এবং মূল্য নিয়ে ফাটকাবাজদের কারসাজির জন্য। লক্ষণীয় যে নতুন স্ল্যাব, রেট এবং রিবেটগুলি শুধুমাত্র নতুন ব্যবস্থার অধীনে থাকা করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। নুতন স্কিমের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করলে যে কেউ এই সুবিধা পাবেন না। অর্থাৎ ২০২৫-২৬ বাজেটে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া এক লক্ষ কোটি টাকা ত্রাণ থেকে যে সংখ্যক আয়কর দাতা উপকৃত হতে পারেন তারা আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত নয়, উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। আবার নিয়মিত মজুরি বা বেতন প্রাপ্ত শ্রমিকরা ভারতের ৬৫ কোটি শক্তিশালী শ্রমিকের প্রায় ২০ শতাংশ বা প্রায় ১২ থেকে ১৩ কোটি শ্রমিক— যাদের প্রকৃত আয় ক্রমাগত কমছে। ফলে আয়কর ছাড় দিয়ে এই অংশের শ্রমিকদের কোনও সুবিধা দেওয়া বা এদের ভোগের মানকে উন্নত করা সম্ভবপর নয়। কারণ, এরা অধিকাংশই করদাতাদের মধ্যে থাকার মতো যথেষ্ট উপার্জনই করেন না।

আমরা জানি উপরের দিকে থাকা বিত্তবানদের ট্যাক্স ছাড় দিয়ে তাদের ব্যয়বৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়িয়ে জাতীয় আয় বাড়ানোর তুলনায় সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ালে তার মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট সবসময়ই বেশি হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে সরকার ব্যয়বৃদ্ধি করলে মানুষকে নিজের পকেটের টাকা খরচ করতে হয় কম, যা তার ক্রয়ক্ষমতাকে কিছুটা বৃদ্ধি করে। যেহেতু বিত্তবানদের তুলনায় দরিদ্র অংশের মানুষের ভোগব্যয় প্রবণতা বেশি থাকে, তাই দরিদ্র মানুষের সম্মিলিত আয় দেশের কিছু ভোগ্যপণ্যের কেনাকাটা বাড়তেও সাহায্য করে।

সত্যটা হল, আয়কর ছাড়ের সুযোগ যে ১০ শতাংশ মানুষ পাবে তার বাইরে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের জন্য, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, কর্মসংস্থানের জন্য এই বাজেটে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। উপরন্তু কর ছাড় দিয়ে যে ১ লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হবে, তা সরকার জনগণের ঘাড় ভেঙে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সাহায্যে চলা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা ছাঁটাই করে তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। বাজেটে নতুন কোনও ব্যয় বৃদ্ধির পরিকল্পনাও সরকার নেয়নি। এমতাবস্থায় মূল্যবৃদ্ধিকে রোধ করে ধারাবাহিক কর্মসংস্থান বাড়াতে না পারলে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন বা বিজেপি সরকারের ‘বিকশিত ভারতে’র স্বপ্ন পূরণ হওয়া অসম্ভব। পুঁজিবাদী ভারতে আর্থিক বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। এটা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত নিয়মের জন্যই হচ্ছে। আর পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতো বর্তমান বিজেপি সরকারও দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির সম্পূর্ণ সেবাদাস রূপে তাদের স্বার্থকেই রক্ষা করে চলেছে। যার প্রতিফলন ঘটছে দেশে কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা বৃদ্ধি এবং ধনী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। এই ব্যবস্থাই পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই সমস্ত সরকারি নীতি পরিচালিত হতে বাধ্য। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে দেশের সিংহভাগ শ্রমিক-কৃষক-খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কোনও সুরাহার দিশা এই বাজেটে নেই। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফা গত বছর ১৫ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু মজুরি তো বাড়েইনি, বরং মুদ্রাস্ফীতিকে ধরলে অনেক কমেছে। সরকার ও প্রচারযন্ত্রের প্রচারের ঢক্কানিনাদে এই সত্য যেন আমরা ভুলে না যাই।

বিকল্প হতে পারেনি আপ

তিনের পাতার পর

হচ্ছেন তাঁদেরও এই শ্রেণি রাজনীতিটি বুঝতে হবে। না হলে বিজেপির অপশাসনে আবার একদিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে পুঁজিপতি শ্রেণি সে দিন তাদেরই বিশ্বস্ত সেবক কোনও একটি দলকে ‘বিকল্প’ হিসাবে জনগণের সামনে উপস্থিত করবে এবং তার পক্ষে ব্যাপক প্রচার দিতে থাকবে। তখন একই রকম ভাবে কোনও রকম বিচার না করে সেই প্রচারে ভুলে মানুষ তাকেই সমর্থন করে বসবে এবং আবার হতাশ হবে।

সর্বভারতীয় স্তরে এনডিএ বা ইন্ডিয়া, রাজ্য স্তরে এই দল বা ওই দল— এই জোট বা ওই জোট— এই যে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বা দ্বিজোট ব্যবস্থা, এর মধ্য দিয়ে যে ভোট রাজনীতি চলছে— তা শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার একটি ফ্যাসিবাদী প্রচেষ্টা।

বহু মানুষ যথার্থ শ্রেণি চেতনার অভাবে মনে করে সব দলই সমান। বাস্তবে সত্যি সব দল সমান নয়। যে দলটি যথার্থই শোষিত শ্রেণির স্বার্থে লড়াই করে চলেছে শ্রেণি চেতনা দিয়েই তাকে চিনে নিতে হবে। সেই দলের শক্তি কম থাকলে শোষিত মানুষের দায়িত্ব তাকে শক্তিশালী করা এবং সেই শক্তির উপর দাঁড়িয়ে শোষিত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় শ্রেণিসংগ্রামকে তীব্র করা। তখন এটা দেখা চলে না যে, সেই দলের এমএলএ-এমপি আছে কি না, বা ভোটে বিপুল সমর্থন পায় কি না।

এ কথা কোনও ভাবেই ভুলে গেলে চলবে না যে, শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী শ্রেণিদলকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব শোষিত শ্রেণিরই, পুঁজিপতিরা তা করে দেবে না।

শিল্প নেই কেন

একের পাতার পর

হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। কেনাকাটা না বাড়লে শিল্পে বিনিয়োগ হবেই বা কী করে? এই সমস্যাটা আড়াল করতে অনেকেই ব্যস্ত। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ— মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলেই বলছেন, এই অর্থব্যবস্থাতেই তারা সমৃদ্ধি আনবেন। মুখ্যমন্ত্রী সমবেত কোরাসে গাইছেন— বাংলা বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কে নেই এই কোরাসে? মুখ্যমন্ত্রী বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছেন, চল্লিশটি দেশ তাদের আমন্ত্রণে সামিল হয়েছে, ২৫ জন রাষ্ট্রদূত এসেছেন। শিল্প প্রতিনিধি এসেছেন পাঁচ হাজারেরও বেশি। উপস্থিত শিল্পপতিরা এ রাজ্যের শিল্প পরিবেশের গুণগানের বন্যা বইয়েছেন।

কর্পোরেট পুঁজি পরিচালিত সংবাদমাধ্যম এবং তাদের প্রচারক স্তাবকরা বলে থাকে, আন্দোলনের জন্যই বাংলা থেকে শিল্পপতিরা মুখ ঘোরাচ্ছেন। ওটা না থাকলেই শিল্পের বান ডাকবে বাংলায়! কিন্তু এ কথা যে ঠিক নয় সরকারি পরিসংখ্যানই দেখিয়েছে। আন্দোলন আদৌ না হলেও মালিকরা কারখানা লকআউট করছে, লে-অফ করছে। অতি মুনাফার লোভে পরিষেবা কিংবা শেয়ারের ফাটকায় খাটানোর জন্য উৎপাদন শিল্প থেকে তারা পুঁজি তুলে নিচ্ছে। পুঁজির নিয়মেই যেখানে বেশি মুনাফার সন্ধান পায়, পুঁজি সেখানে যায়।

একটা কথা সংবাদমাধ্যমের কর্ণধাররা খুব প্রচার করেন, শিল্প গড়তে গেলে সরকারের তরফে অনুদান দিতে হবে, বিনা পয়সায় বা নামমাত্র মূল্যে জমি, বিনামূল্যে জল, বিদ্যুৎ দিতে হবে, সুদবিহীন ঋণ বিনাশর্তে পাইয়ে দিতে হবে, সরকারি খরচে সব পরিকাঠামো গড়ে দিতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু তারা কখনওই বলেন না, বাজার থাকলে শিল্প তো স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠার কথা! শিল্প গড়তে পুঁজি মালিকদের এত তোয়াজ করতে হবে কেন? এই তোয়াজেই যদি শিল্পে জোয়ার আসত, তা হলে গুজরাটে ৪০০ বস্ত্র কারখানা, ২০টির বেশি বড় কাগজকল সহ ২ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে আছে কেন? আমেদাবাদ তার ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার তকমা হারাল কেন? শত শত হিরে শিল্প গত বছর বন্ধ হয়ে গেল কেন? গুজরাটে ৬০০ কেমিক্যাল কারখানা ২০২৩-এ পাততাড়ি গুটিয়েছে কেন? সানন্দে বন্ধ হওয়া ন্যানো গাড়ির কথা না হয় বাদই দিলাম। গুজরাট সরকার তো একেবারে ঢেলে সুবিধা দিয়েছিল! এর কারণ পুঁজিবাদ সৃষ্ট মন্দা।

এ বারের শিল্প সম্মেলনে পুঁজিপতিরা বাংলা সম্পর্কে, বাংলায় বিনিয়োগ সম্ভাবনা সম্পর্কে এত গদগদ প্রশংসা করলেন কেন? কারণ রাজ্যের তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে নানা বিষয়ে প্রভূত সাহায্য, সহযোগিতা এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা বাজার, তা গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বাজার কী ভাবে গড়ে দিচ্ছে? শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী তার ৯৪টি সামাজিক প্রকল্পের কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ছাত্রদের সাইকেল দেওয়া, স্মার্ট ফোন দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রকল্প যেগুলি এই সরকার চালাচ্ছে তা বারবার উচ্চারণ করে বলেছেন— এই সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে তিনি ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে তুলে এনেছেন। এ দেশে দারিদ্রসীমার মান নানা সময়ই পাল্টানো হয়েছে। মাপকাঠি অবনমিত করে উন্নয়নের তথ্যও সরকার নানা সময়ে প্রচার করেছে। এর দ্বারা কাগজে-কলমে উন্নয়ন দেখানো যেতে পারে। বাস্তবটা বড় কঠোর। বাস্তবে কেনার ক্ষমতা বেড়েছে কতটুকু?

এ বারের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিজেপি সরকারও সরকারি সাহায্য দিয়ে বাজার তৈরি করে দেওয়ার পথেই হেঁটেছে। মধ্যবিত্তদের জন্য বিপুল কর ছাড় দিয়েছে। কয়েক মাস আগে থেকে পুঁজিপতিরা সরকারের কাছে এই আবদারই করেছিল সরকার যাতে নানা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে জনগণের হাতে টাকা পৌঁছায়। কারণ পুঁজিপতিদের পণ্য বিক্রি কমে যাচ্ছিল। তার নানা পরিসংখ্যানও খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছিল। এর কারণ কী? কারণ একদিকে তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, অন্য দিকে মানুষের রোজগার কমে যাওয়া— এই দুইয়ের মিলিত প্রভাবে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। মানুষের যতটুকু রোজগার তার সিংহভাগ খরচ হয়ে যাচ্ছে খাদ্যপণ্যের পিছনে।

অন্যান্য ভোগ্যপণ্য বা বিলাসপণ্য কেনা মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এই সঙ্কট পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সর্বত্রই। কখনও এই বাজার সংকট একটু কমে তখন অর্থনীতি একটু চাঙ্গা হয়। আবার যখন এই সংকট বাড়ে অর্থনীতি ঝিমোয়। এইভাবে কখনো ঝিমানো এবং কখনো সরকারি সাহায্যে খানিক চাঙ্গা হওয়া, এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলছে। এই সমস্যার জন্যই সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাপক শিল্পায়ন আজ আর সম্ভব নয়। আজকের যুগটা পুঁজির অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ নয়, একচেটিয়া পুঁজির যুগ। এখন শিল্প শ্রমিক-প্রধান হবে না। শ্রমিক-প্রধান শিল্প যা ছিল তা ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে। প্রযুক্তি প্রধান শিল্প, যেখানে শ্রমিক বেশি প্রয়োজন হয় না, তেমন শিল্প কিছু কিছু গড়ে উঠছে। এতে বিপুল কর্মসংস্থানের কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ফেরারও আশা নেই।

ঠিক সেই কারণে এতগুলো শিল্প সম্মেলন হলেও এত লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এলেও বাস্তবে তার অতি সামান্য বিনিয়োগ হচ্ছে। প্রস্তাবিত লগ্নির প্রায় সবই ফাইলবন্দি হয়ে থাকছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে না। যেমন, ২০১৯ সালে দিঘার শিল্প সম্মেলন থেকে তাজপুর বন্দরের শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ২০২২ সালে আদানি গোষ্ঠীকে এ সংক্রান্ত আগ্রহপত্র দেওয়া হয়। ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হওয়ার কথা এখানে। শঙ্করপুরে সাইট অফিসও খোলা হয়। তারপরে আর কাজ এগোয়নি। এ বার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাজপুর বন্দর নিয়ে উচ্চবাচ্য হয়নি (আনন্দবাজার পত্রিকা-১৪.২.২০২৫)।

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ এর জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে এ রাজ্যে যত প্রস্তাব আসে, বাস্তবায়িত হয়েছে তার মাত্র ১০ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এ বারের শিল্প সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। গত বছরের থেকে তা প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বেশি। এর মধ্যে মউ বা সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর রয়েছে ২১২টি। কোথায় কোথায় লগ্নির প্রস্তাব এসেছে? ৯৩৬৮ কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাবিত হয়েছে স্বাস্থ্য খাতে। বস্ত্রক্ষেত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে ৩৬০০ কোটি টাকার মতো। বলা হয়েছে হাওড়া হুগলি নদিয়ায় সাতটি বস্ত্র কারখানা হবে। এতে কিছু মানুষের চাকরি— তা স্থায়ী বা অস্থায়ী যা-ই হোক কিছু হয়ত হবে। কিন্তু বস্ত্রশিল্পে এমনিতেই মন্দা চলছে। বৃহৎ পুঁজির ব্র্যান্ডেড বস্ত্র ব্যবসা ছোট বস্ত্র কারখানাগুলোকে শেষ করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের মতো আন্তর্জাতিক নামী বস্ত্র কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কিছু কারখানা গড়ে তুলতে চায় বলে মনে হচ্ছে। এগুলি কার্যত হয়ে দাঁড়াবে শ্রমিক নিষ্পেষণ কারখানা, যা বাংলাদেশ সহ এশিয়ার নানা দেশে ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

পুঁজিপতিরা ক্রমাগত উৎপাদন শিল্প থেকে সরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিমা ইত্যাদি পরিষেবায় বিনিয়োগের দিক ছুটছে। তাতে কম বেতনের কিছু কাজও তৈরি হতে পারে। কিন্তু মূল বাজারের সংকট এই জায়গায় থাকলে এ সব টোটকায় আদৌ বেশি দিন চলবে না।

দুটি ক্ষেত্র নিয়ে এই শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে খুব হইচই হয়েছে। এক, ডেউচা-পাঁচামিতে কয়লা উত্তোলন প্রকল্প, দুই, উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে তেল উত্তোলন প্রকল্প। তেল উত্তোলন করবে ওএনজিসি। রাজ্য সরকার এ জন্য ১৫ একর জমিও তাদের দিয়েছে। সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। এখানে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ, কিছু কর্মসংস্থান হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে যারা উচ্ছেদ হচ্ছে তাদের পুনর্বাসন জরুরি। ডেউচা-পাঁচামিতে পুনর্বাসন যে ঠিকমতো হচ্ছে না, এ নিয়ে যে বিক্ষোভ মানুষের মধ্যে রয়েছে, তা ইতিমধ্যেই সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে।

শিল্প সম্মেলনে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রস্তাব হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকা লগ্নির। বলা হয়েছে এতে ১৫ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান হবে। এখানেই রয়েছে ঘোরতর অনিশ্চয়তা। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এমন নিম্নস্তরে রয়েছে যে তা ভোগ্যপণ্য বা বিলাসপণ্যের নির্ভরযোগ্য একটা বাজার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। তাহলে কীসের ভিত্তিতে উৎপাদন হবে? কোটি কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব যে শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না তার কারণ তো এখানেই।

তা হলে সঙ্কটের সমাধান কী? যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে তাকে সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। এমন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে উৎপাদন মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে না। এই কাজটিই আজ জরুরি।

জীবনাবসান

কলকাতায় দলের গড়িয়া লোকাল কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য কমরেড গোরাচাঁদ হালদার ৩০ জানুয়ারি ৭৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে তাঁর আদি বাসস্থান দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘাটেশ্বর অঞ্চলে অত্যন্ত ছোট বয়সে তিনি পারিবারিক সূত্রে দলের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। সমাজের পিছিয়ে পড়া গরিব মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবি আদায়ে সংগ্রাম শুরু করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই লোকাল কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। পরিবারের দারিদ্রের কারণে তিনি প্রথাগত শিক্ষা বেশি দূর গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিটি রচনা ও পার্টির প্রকাশিত পত্রপত্রিকা খুঁটিয়ে পড়তেন ও কমরেডদের মধ্যে তত্ত্বগত আলোচনায় তর্কবিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। শুধু তাই নয়, দলের সংস্কৃতি আয়ত্ত করার জন্য তাঁর বিশেষ সংগ্রাম ছিল। তিনি চাকরি করতেন ক্যালকাটা টেলিফোনের যাদবপুর বেহালা এক্সচেঞ্জে। পার্টির অনুমতি নিয়ে তিনি গড়িয়া পাটুলি বিএসএনএল কোয়ার্টারে ও পরে গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন সাহাপাড়া উদয়গড়ে চলে আসেন।

গড়িয়া লোকাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এলাকায় গণআন্দোলন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি গড়িয়া লোকাল কমিটির সদস্য হিসেবেও নির্বাচিত হন এবং লোকাল কমিটির কাজে সক্রিয় ও সৃজনশীল ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। পরিবারের মধ্যেও তিনি উন্নত নৈতিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র আদর্শচ্যুত হলে তিনি কঠোরভাবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। কোনও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি নিজ উদ্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যুৎ আন্দোলন, রেলযাত্রী কমিটি, পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সহ নিজ বাসভবন উদয়গড় সাহাপাড়াতেও উন্নয়ন কমিটি প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক কাজে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করেন ও নেতৃত্ব দেন। তাঁর স্ত্রী-কন্যা সহ আত্মীয়-স্বজনকে দলে যুক্ত করেন। অসুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত পার্টির পত্রিকা গণদাবী সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্র দলের কর্মী-সমর্থক-দরদিরা এবং এলাকার সাধারণ মানুষ তাঁর বাসভবনে ও গড়িয়া লোকাল অফিসে জড়ো হন এবং প্রয়াত কমরেড গোরাচাঁদ হালদারের মরদেহে মাল্যদান করে ও রক্তপতাকা অর্ধনমিত রেখে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাসভবন সংলগ্ন গড়িয়া উদয়পুরে প্রকাশ্য স্মরণসভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুব্রত গৌড়ী। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। সভাপতিত্ব করেন দলের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অনিন্দ্য রায়চৌধুরী। স্থানীয় বহু সাধারণ মানুষ, তাঁর আত্মীয়-স্বজন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় তাঁর সহকর্মীরা সহ অনেকেই স্মৃতিচারণে তাঁর চরিত্রের গুণাবলি তুলে ধরেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর আদি বাসস্থান এলাকায় স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড গোরাচাঁদ হালদার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 28 Bengali Weekly February 21, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

অরণ্য সংরক্ষণ সংশোধন আইন-২০২৩

বাতিলের দাবিতে ওড়িশায় কনভেনশন

অরণ্য সংরক্ষণ সংশোধন আইন-২০২৩ বাতিল, অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ চালু, অরণ্যে বসবাসরত উপজাতি ও সাধারণ মানুষের উচ্ছেদ বন্ধ এবং আসন্ন ধ্বংস থেকে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষার দাবিতে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি (এআইজেএএসসি)-র ডাকে ৭ ফেব্রুয়ারি ওড়িশার জশিপুরে রাজ্যস্তরীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সদাশিব দাস। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সর্বভারতীয় সভাপতি শম্ভুনাথ নায়েক, সাধারণ সম্পাদক

বিসম্বর মুড়া, প্রধান উপদেষ্টা স্বপন ঘোষ প্রমুখ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাঁচশোরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন প্রকাশ মল্লিক। জনস্বার্থবিরোধী অরণ্য সংরক্ষণ সংশোধন আইন-২০২৩-এর মাধ্যমে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার খনি, জঙ্গল, পাহাড়, নদী, ঝরণা ও জমি সহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই আইনের বলে অরণ্যভূমি অন্যান্য কাজে ব্যবহারের রাস্তা খুলে দেওয়া হচ্ছে, অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ অনুযায়ী উপজাতি ও বনবাসীদের জন্য অরণ্যভূমি বরাদ্দ করার যে ক্ষমতা গ্রাম-কাউন্সিলগুলির ছিল, তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে বনভূমি থেকে লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। কনভেনশনে বক্তারা এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এই আইন বাতিলের দাবিতে মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কনভেনশনে প্রাক্তন বিধায়ক শম্ভুনাথ নায়েককে উপদেষ্টা এবং সদাশিব দাসকে আহ্বায়ক করে ১৭ সদস্যের এআইজেএএসসি-র ওড়িশা শাখা গঠিত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্যাম্পাসেই ছাত্রছাত্রীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। এগুলি সমাধানের দাবি জানিয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। দাবি জানানো হয়, অবিলম্বে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে, স্থায়ী অধ্যাপক ও কর্মচারী উপযুক্ত সংখ্যায় নিয়োগ করতে হবে, সমস্ত বিভাগে নিয়মিত পঠন-পাঠন চালু এবং ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরির পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে।

প্রত্যেক ক্যাম্পাসে জেরক্স ও প্রিন্টিং সেন্টার চালু, রেল কনসেশন, সমস্ত ক্যাম্পাস ক্যান্টিনে সস্তায় উন্নত মানের খাবার পরিবেশন, চিকিৎসা কেন্দ্র চালু, খারাপ লিফট সারানো, ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা ফেরানো, ক্ষুদিরাম শিক্ষা প্রাঙ্গণে (আলিপুর ক্যাম্পাস) ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি স্থাপন করতে হবে। এ ছাড়াও অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের

অভ্যন্তরে ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা, স্নাতকোত্তর স্তরে দ্বিতীয়বার এমএ করার সুযোগ দেওয়া, সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষানীতি ২০২৩ অবিলম্বে বাতিল করার দাবি জানানো হয়।

৩১ জানুয়ারি সিকিমে সিংটামের বালুটারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনসংগ্রাম নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে এআইডিওয়াইও। ৩০ জনের বেশি যুবকর্মী এতে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা করেন এসইউসিআই(সি) নেতা কমরেড সৌরভ মুখার্জী। উপস্থিত যুবকর্মীদের হাতে মেমেন্টো ও সংগঠনের বইপত্র তুলে দেন সংগঠক কমরেড পদ্মলোচন সাহু।

হাসপাতালে ৯১১টি ওষুধ

কিন্তু রোগীরা তার দেখা পান কই!

টাকার মাত্রাতিরিক্ত অবমূল্যায়ন হলেও রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যখাতে প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দ বাড়াল না। স্বাস্থ্যখাতে এ বারের এস্টিমেটেড বাজেট হল ২১৩৫০ কোটি টাকা। খাতায়-কলমে দেড় হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি দেখালেও মূল্যবৃদ্ধিকে হিসাবে নিলে বরাদ্দ দাঁড়াবে গতবারের বাজেটেরই মতো। তার উপরে টাকার অবমূল্যায়ন ধরলে বাজেট গতবারের চেয়ে কমবে অনেকটাই।

রাজ্য সরকার বলছে রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ। তা হলে তো বাজেটও বাড়ার কথা ছিল। এ বছর সর্বসাকুল্যে স্বাস্থ্য বাজেট রাজ্য জিডিপির ১.০৫ শতাংশ মাত্র।

ঐতিহাসিক ভোর কমিটির সুপারিশ ছিল দেশের মোট জিডিপির ন্যূনতম ৫ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ করার। ভারতের মতো বিশাল যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যের ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ অনেক বেশি হওয়ার কথা। কারণ জনকল্যাণমূলক কাজগুলি রাজ্য সরকারেরই উপর বেশি বর্তায়। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বাজেট মোট বাজেটের ১০ শতাংশ হওয়ার কথা এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বাজেট সামগ্রিক বাজেটের ১৫ শতাংশ হওয়ার কথা। যেখানে এস্টিমেটেড বাজেটই হল রাজ্যের মূল বাজেটের মাত্র ৬.৯ শতাংশ।

পরিবর্তিত বাজেট ধরলে এই শতাংশ আরও অনেক কমে যাবে সন্দেহ নাই। ফলে যে রাজ্যে এখনও মাতৃমৃত্যুর হার দেশের গড়ের অনেক উপরে (দেশ ৯৭ এবং রাজ্য ১০৩), সেখানে স্বাস্থ্য বাজেট না বাড়িয়ে আরও কমালে কীভাবে মাতৃমৃত্যুর হার কমানো যাবে? যে রাজ্যে নিষিদ্ধ ওষুধ কোম্পানির ওষুধের রমরমা বাজার, যেখানে হাসপাতালে অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ করা হয় এবং নিম্নমানের স্যালাইনে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সেখানে ওষুধের গুণমান রক্ষার কথা বাজেটে নেই। বাজেটে ফলাও করে বলা হয়েছে ৯১১টি ওষুধ নাকি সরবরাহ করা হয়! ভুক্তভোগী মানুষ মাত্রেই তা জানেন হাসপাতালে ক'টি ওষুধ পাওয়া যায় আর ক'টি কিনে দিতে হয়। তার উপরে ওষুধ কোম্পানিগুলির সাথে সরকারের অশুভ আঁতাতের ফলে হাসপাতালগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধে ছেয়ে গেছে। ভেজাল ওষুধ ও স্যালাইনে রোগীমৃত্যু লেগেই আছে।

সম্প্রতি আন্দোলনের চাপে সরকার জাল ওষুধের কারবারি ওষুধ কোম্পানিগুলিকে সাময়িক সরবরাহ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে হাসপাতালগুলোতে ওষুধের সংকট সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। মানুষ ওষুধ পাচ্ছেন না। ভ্রান্ত ওষুধ নীতিতে টিবির ওষুধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। বাজেটে যৌথ উদ্যোগে চলা ফেয়ার প্রাইস শপের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যে ওষুধের গুণমান অত্যন্ত নিম্নমানের। পিপিপি নীতিতে চলা এই ওষুধের ব্যবসায়ের মাধ্যমে মানুষের ট্যাক্সের টাকা চালান হয়ে যায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের পকেটে। সরকার ওষুধ সরবরাহে এই নীতির উপর বেশি জোর দিয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিপুল পরিকাঠামো এবং ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীর ঘাটতি রয়েছে। যার দরুন বিনা চিকিৎসায় অথবা অর্ধ চিকিৎসায় মানুষের মৃত্যুমিছিল চলছে। বিপুল এই ঘাটতি মেটাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হল না, এমনকি এই ঘাটতির কথা স্বীকার পর্যন্ত করা হল না। এর থেকেই বোঝা যায় সরকার মানুষের জীবন সম্পর্কে কতটা উদাসীন। কেন্দ্র, রাজ্য উভয় সরকারই মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে একই রকমভাবে ছিনিমিনি খেলছে।

এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত সমস্ত বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে

প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট • ব্লক-৪ • স্টল নং - ১৫

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com